Welcome

INDUSTRIAL MANAGEMENT

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট

65852

শিক্ষক পরিচিতি

তাসলিমা আক্তার
চীফ ইনস্ট্রাক্টর(নন-টেক)বাংলা
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

TASLIMA AKTER

Chief Instructor(Non-tech)

ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারনা ও নীতিসমূহ

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন মানব সংগঠনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। বাংলা শব্দ ‘ব্যবস্থাপনা’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘ম্যানেজমেন্ট’ (Management)। এই Mangaement শব্দটি ইতালিয়ান শব্দ ‘Maneggiare’ থেকে ইংরেজিতে এসেছে, এর শাব্দিক অর্থ অশ্ব পরিচালনা করা। সময়ের বিবর্তনে এই ‘অশ্ব পরিচালনা’ মানব জাতিকে পরিচালনা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা কী বা ব্যবস্থাপনা কাকে বলে ত অল্প কথায় প্রকাশ করা কঠিন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্ডিত ও গবেষক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপনার কাকে বলে ?

নিম্নে কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেওল (Henry Fayol) এর মতে “ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ করা (To manage is to forecast & plan, to organise, to command, to co-ordinate and control)।

টেরি এবং ফ্রাংকলিন (Terry & Franklin) এর মতে “ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদ সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের নিমিত্তে পরিকল্পনা, সংগঠন, উদ্‌বুদ্ধ করন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যের সাথে সম্পৃক্ত।”

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি উপায়, বিষয় এবং বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান যা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ একত্রিকরণ ও এগুলোর পূর্ণ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশন, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

ব্যবস্থাপনার সচিত্র আলোচনাঃ

6M মেথডঃ

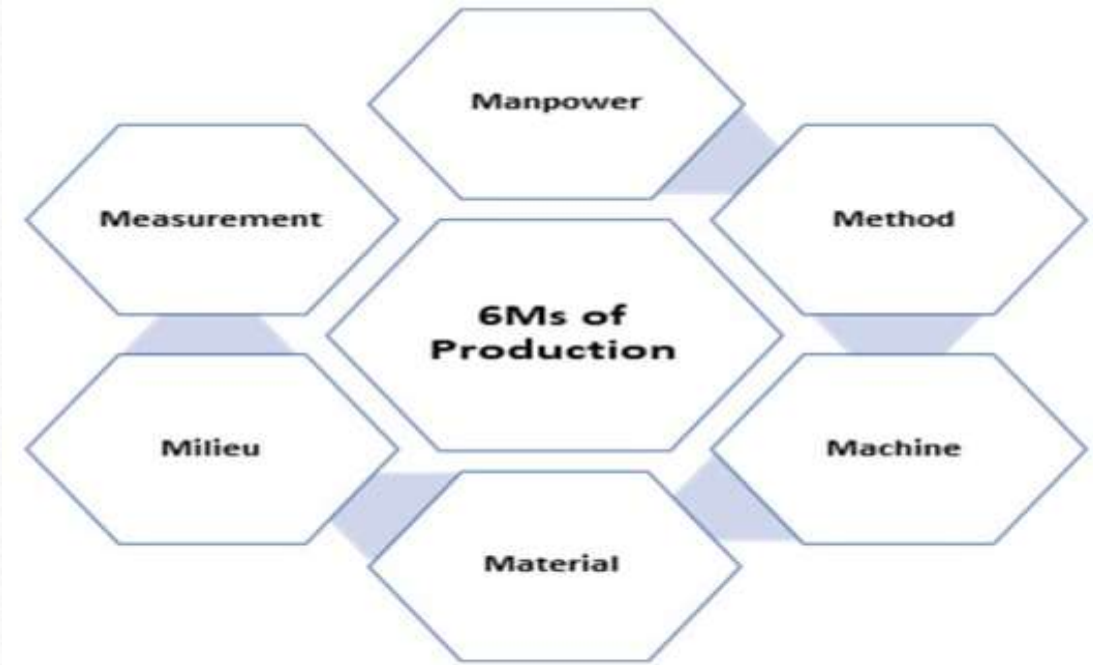

Figure A – The 6Ms of Production.

ব্যবস্থাপনার নীতি

আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল (Henry Fayol) ১৯১৬ সালে ফ্রান্সে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ জেনারেল অ্যান্ড ইনডাসট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট (General and Industrial Management) এ ১৪টি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রদান করেছেন; এই নীতিগুলোই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে মানা হয়।

হেনরি ফেয়লের ব্যবস্থাপনার ১৪ টি নীতি:

১. কার্যবিভাগ (Division of work)

প্রতিষ্ঠানের কাজকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সুষ্ঠুভাবে নির্দিষ্ট করার নীতিকেই কার্য বিভাজন নীতি বলে।

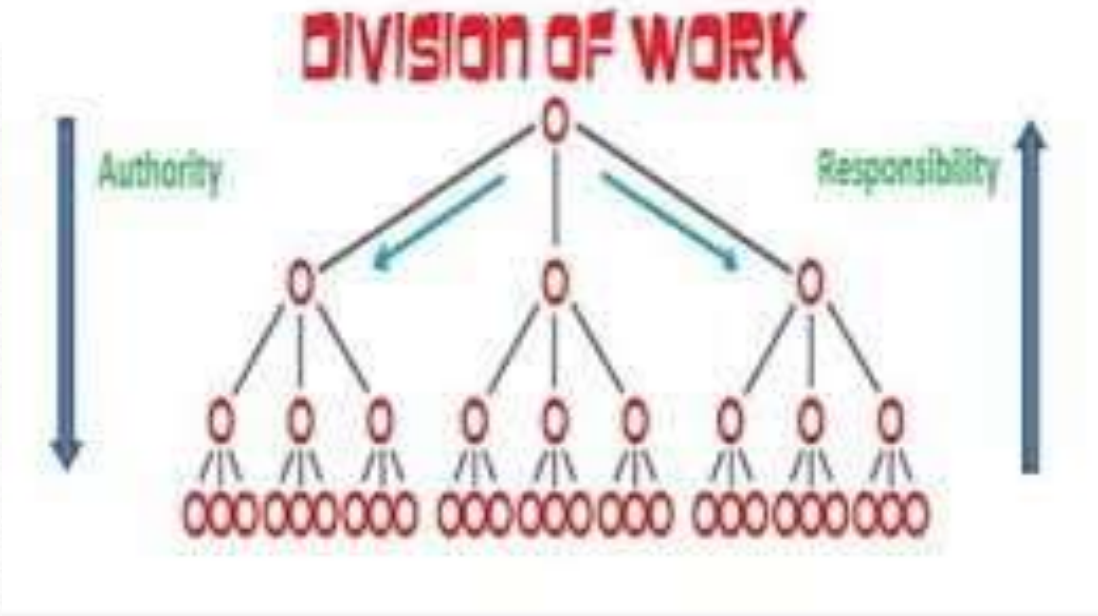

২.কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and Responsibility)

কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর ঘনিষ্ঠতার সাথে সম্পর্কিত। কোনো কর্মীকে কার্য সম্পাদন করার জন্য কর্তৃত্ব অর্পন করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও প্রদান করতে হবে। আবার এরূপ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত অন্যথায় কার্যক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।

৩. *আদেশের ঐক্য (Unity of Command)*

আদেশের ঐক্য নীতির মূল কথা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মী শুধু একজন বসের (Boss) অধীনে থাকবে এবং তার
আদেশ গ্রহণ করবে। কারণ একাধিক বসের অধীনে একজন কর্মী সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা
এবং সমস্যাই দেখা দেয়।

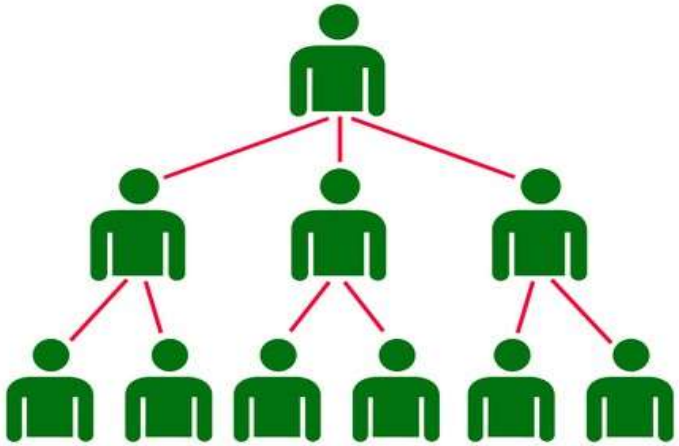

৪. *নির্দেশনার ঐক্য (Unity of Direction)*

উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য পূর্ব নির্দেশনার সাথে মিল রেখে পরবর্তী নির্দেশনা প্রদানের কাজকে ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনার ঐক্য নীতি বলে।

৫. কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ(Centralization and Decentralization)

উত্তরঃ প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিচের পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলে তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।

৬. *সাম্য (Equity)*

সকল শ্রমিক ও কর্মীর প্রতি সমান এবং সম্মানজনক আচরণ করা উচিত। একজন ব্যবস্থাপক বা প্রশাসকের দায়িত্ব হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কেউ যেন বৈষম্যের সম্মুখীন না হয়।

৭. *নিয়মানুবর্তিতা (Dicipline)*

প্রতিষ্ঠানের জন্য উত্তম নিয়ম নীতি নির্ধারণ এবং তা মেনে চলার নীতিকেই ব্যবস্থাপনায় নিয়মানুবর্তিতার নীতি বলে। এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনগণ যদি নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকেন তবে প্রতিষ্ঠানে নিয়মানুবর্তিতার নীতি অনুসরণ সহজ হয়।

৮. শৃঙ্খলা (Principal of Order)

যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে এবং সঠিক বস্তুকে সঠিক স্থানে স্থাপনের নীতিকে ব্যবস্থাপনায় শৃঙখলার নীতি বলে ।

৯. *সাধারণ স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ (Subordination of individual to general interest) :*

ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে প্রাতিষ্ঠানিক বা সাধারণ স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান এর নীতিকে ব্যবস্থাপনায় সাধারণ স্বার্থে নিজস্ব স্বার্থ

১০. চাকরির স্থায়িত্ব (Stability of tenure)

এই নীতি অনুযায়ী মনে করা হয় যে, কর্মীদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করা হলে তা কর্মীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। চাকরির স্থায়ী কে কর্মীরা গৌরবের বিষয় মনে করে।

১১. উদ্যোগ (Initiative)

নতুন নতুন পদ্ধতি বা উপায় উদ্ভাবন ও আবিস্কার করার পক্ষে কর্মীদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হেনরি ফেয়লের গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীদের আগ্রহ বাড়ে এবং উন্নত কর্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

১২. *জোড়া-মই-শিকল (Scalar Chain)*

প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রবাহের একটি শিকল বা চেইন থাকবে। এই শিকল কর্তৃত্বের প্রবাহ ও যোগাযোগের উর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি নির্দেশ করে। জরুরি কাজে সংগঠনের নীচু স্তরের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা থাকবে।

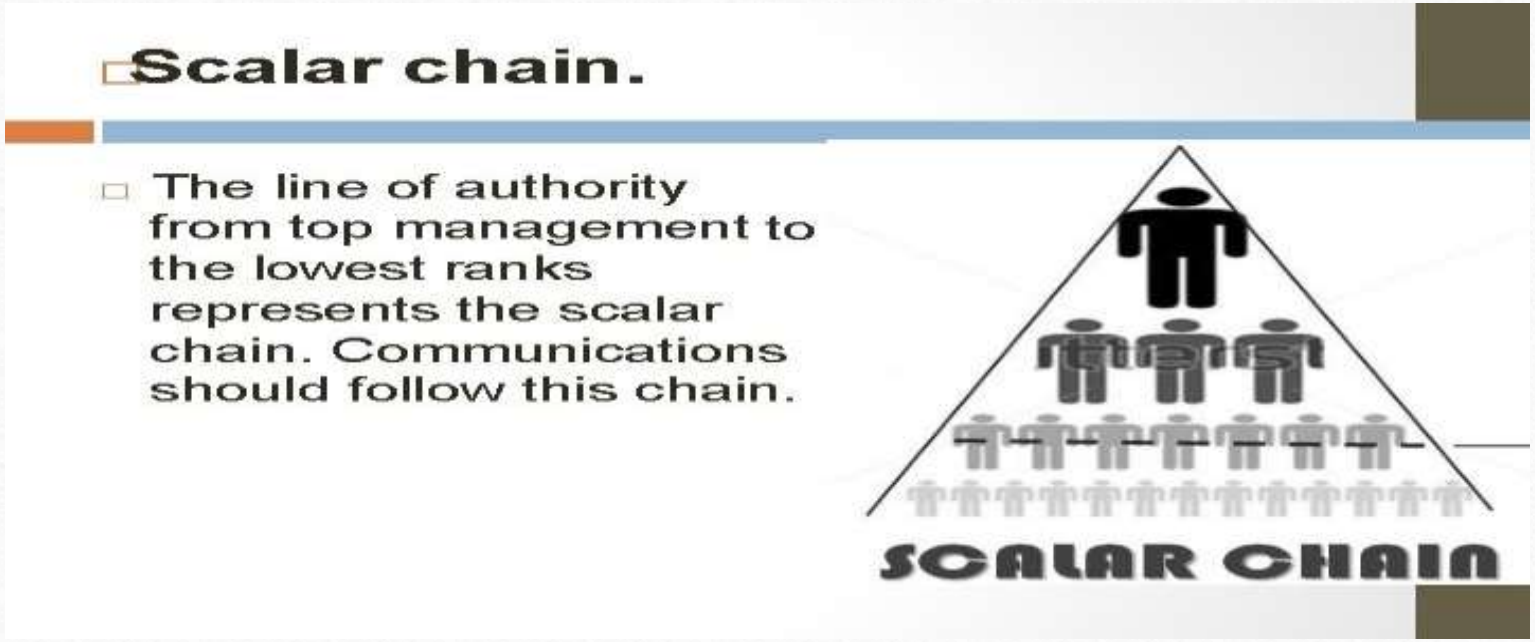

১৩. *পারিশ্রমিক (Remuneration)*

ন্যায্য বেতন এবং মজুরি নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীদের প্রাপ্য। তাই বেতন ও মজুরির একটি উপযুক্ত কাঠামোর প্রবর্তন করে শ্রমিক-কর্মীদেরকে সর্বাধিক সন্তুষ্টি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। হেনরি ফেয়লের মতে, পারিশ্রমিক ন্যায্য হতে হবে এবং তা প্রদান করার যুক্তিসংগত বা সঠিক পন্থা থাকতে হবে।

১৪. *একতাই বল (Esprit de corps/Unity Is Strength)* যেখানে একতা সেখানেই শক্তি। ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান নীতি হলো একে অপরকে অনুপ্রাণিত করা এবং নিয়মিতভাবে একে অপরের সহায়ক হওয়া। একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বোঝাপড়ার বিকাশ একটি ইতিবাচক ও প্রত্যাশিত কর্মপরিবেশ ও ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে। ব্যবস্থাপকের উচিৎ তার অধীনস্থ কর্মচারীদের দলগত প্রচেষ্টা, একতা ও ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি উপায়, বিষয় এবং বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান যা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ একত্রিকরণ ও এগুলোর পূর্ণ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশন, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি উপায়, বিষয় এবং বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান যা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ একত্রিকরণ ও এগুলোর পূর্ণ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশন, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

পরিকল্পনার ধারনা

পরিকল্পনা কি?

পরিকল্পনা হলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অগ্রিম নকশা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পরিকল্পনা।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

পরিকল্পনা ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কাকে করতে হবে এবং কখন করতে হবে প্রভৃতি বিষয় পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়।

পরিকল্পনা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যসমূহই প্রতিষ্ঠা করে না বরং প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত সম্পদাদির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ সকল উদ্দেশ্য লাভজনকভাবে বাস্তবায়ন করে থাকে। নিয়ে পরিকল্পনার কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

বিশেষজ্ঞদের মতে পরিকল্পনা কাকে বলে?

আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক Henri Fayol বলেন, “The plan of action is, at one and the same time, the result envisaged, the line of action to be followed, the stages to go through and the methods to use.”

অর্থাৎ, যে কর্মপন্থা গৃহীত হবে তা, যে সকল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সেটা চলবে তা এবং যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তা নির্ধারণ করা এবং ঐ একই সময়ে ফলাফল বিচার করা।

পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ। প্রতিষ্ঠানের উপায়-উপকরণ ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ব্যবস্থাপনা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আবার, ব্যবস্থাপনার জন্য সব কাজের সফলতা নির্ভর করে পরিকল্পনার গুণগত মানের ওপর। এজন্য ব্যবস্থাপককে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রে তাকে যেসব ধারাবাহিক পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়, বিভিন্ন লেখক সেগুলোকে বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন। তবে এদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পরিকল্পনা প্রণয়নে সাধারণত যেসব পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয় তা নিচে চিত্রের সাহায্যে দেখানো ও বর্ণনা করা হলো-

পরিকল্পনা প্রণয়নের ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ ধাপঃ

1. **ভবিষ্যৎ সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সচেতনতা (Conscious about future opportunities and obstacles):** পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের ভেতর ও বাইরের পরিবেশ থেকে সম্ভাব্য যেসব সুযোগ- সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে, সেগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। এজন্য বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের শক্তি (Strength) ও দুর্বলতা (Weakness) এবং বাহ্যিক পরিবেশের সুবিধা (Opportunity) ও ভীতি (Threat) চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এটি SWOT Analysis নামে পরিচিত।

2. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Determining goal and objective):** পরিকল্পনা সব সময় লক্ষ্যকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ বিশ্লেষণের পর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। প্রথমে মূল লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হয়। এরপর সেগুলোকে উদ্দেশ্য হিসেবে শাখা বা বিভাগের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, বৈধ, বাস্তবসম্মত

৩. প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ (Collecting and analysing necessary data and information): কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম শর্ত হলো পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করা। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন উৎস থেকে সঠিক উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করতে হয়।

৪. পরিকল্পনার আঙিনা নির্ধারণ (Determining planning premises): যেসব অবস্থার মধ্য এই পরিককানার অধিনা দিয়ে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে সেগুলো পূর্বানুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করাকে পরিকল্পনার আঙিনা বা অজ্ঞান নির্ধারণ বলে। অর্থাৎ, পরিকল্পনার সম্ভাব্য ক্ষেত্রেই হলো পরিকল্পনার আঙিনা। এ আঙিনা নিয়ন্ত্রণযোগ্য, আংশিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য বা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য হতে পারে।

৫. বিকল্প কার্যপদ্ধতি উন্নয়ন (Establishing alternative courses of action): পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিভিন্ন উপায় প্রস্তুত বা নির্ধারণ করার কাজকে বিকল্প উদ্ভাবন বলে। সম্ভাব্য কার্যপদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্প কার্যপদ্ধতি বেছে নিতে হয়। যত বেশি বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাবন বা শনাক্ত করা যাবে, পরিকল্পনা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে প্রণয়ন করাও তত সহজ হবে।

৬. বিকল্প কার্যপদ্ধতি মূল্যায়ন (Evaluating alternative courses of action): এ পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণেতাকে বিকল্প কার্যপদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হয়। এক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে বিষ্ণু পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতা এবং সুবিধা-অসুবিধা মূল্যায়ন করতে হয়। সম্ভাব্য ব্যয়, সময়, ভবিষ্যৎ অবস্থা, সামর্থ্য, শক্তি ও দুর্বলতা, কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক সম্পৃক্ততা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে বিকল্পসমূহের গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগিতা মূল্যায়ন করে দেখতে হয়।

৭. সর্বোত্তম কার্যপদ্ধতি গ্রহণ (Taking the best course of action): এক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী মূল্যায়নকৃ বিকল্পসমূহের মধ্য থেকে উত্তম বিকল্প বাছাই করে এবং অন্যগুলো বর্জন করে। তবে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে একাধিক বিকল্প কার্যপদ্ধতি বাছাই করা প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নকারীগণ উত্তম কার্যপদ্ধতির ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে একাধিক বিকল্প কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, নির্ধারিত প্রথম বিকল্প কার্যকর না হলে পরবর্তী বিকল্প নির্ধারণ করে রাখা হয।

৮. সহায়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন (Formulating derivative plan): মূল পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য কিছু সহায়ক বা উপপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। এসব উপপরিকল্পনা মূল পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। যেমন: প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাঁচামাল ক্রয়, নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

৯. বাজেটকরণ (Budgeting): পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশকে বাজেট বলে। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ করণীয় কার্যাবলিকে গাণিতিক বা সংখ্যায় প্রকাশই হলো বাজেট। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মানবশক্তি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাদান ব্যবহৃত হয়। তাই, বাজেটকরণে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস ও আয়-ব্যয়ের খাতগুলো চিহ্নিত করা হয়।

১০. পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ও মূল্যায়ন (Pilot running and evaluation): এ পর্যায়ে পরিকল্পনার উপযুক্ততা বা নির্ভুলতা পরীক্ষা করা হয়। স্থায়ীভাবে গ্রহণ বা বর্জনের আগে একে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। এতে পরিকল্পনাটি সফল বলে বিবেচিত হলে তা চূড়ান্ত করা হয়। অন্যথায়, প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার চিন্তা করতে হয়।

উপসংহারে বলা যায়, পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া। সঠিকভাবে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়।

প্রেষণার ধারনা

প্রেষণা কাকে বলে?

প্রেষণা প্রতিষ্ঠানের চাকাকে সজল রাখে, কর্ম-উদ্দীপনার পরিবেশ সৃষ্টি করে, শিল্প সম্পর্ক গতিশীল রাখে এবং সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে সজীবতা আনে।

কর্মীদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা তথা প্রণোদনা দানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাজে উদ্‌বুদ্ধ করার এ প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলা হয়।|

প্রতিষ্ঠান দুই ধরনের, যথা— সেবামূলক ও উৎপাদনমূলক। যে ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন, তা সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এর শ্রমিক-কর্মী তথা মানব সম্পদ। এ শ্রমিক-কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন করা না হলে তাদের দ্বারা কখনো উত্তম কার্যফল আশা করা যায় না। একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগণ যে সকল কাজ করে থাকেন সেগুলো মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কর্মীদের কাজে অনুপ্রাণিত করা। কর্মীদের প্রত্যাশা, চিন্তা-চেতনা, কাজের প্রকৃতি, কার্য পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন আর্থিক ও অনার্থিক সুবিধাদি প্রদান করতে হয়, যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হতে পারে।

প্রেষণা কী (What Motivation Is):

প্রেষণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। প্রেষণা মানুষের অন্তরে নিহিত একটি সুপ্ত শক্তি যা উজ্জীবিত হলে মানুষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে। অনুপ্রেষিত (motivated) ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, স্বীয় উদ্যোগে, অধিকতর দক্ষতার সাথে তার কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়। অভাব বা প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রেষণার উদ্ভব।

- **শারলেকার (S. A. Sherlekar)** বলেছেন, "যে ব্যবস্থাপকীয় কার্যের সাহায্যে ব্যক্তিবর্গকে কার্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও তাড়িত করা যায় তাকে প্রেষণা বলে"। (Motivation is a managerial function to inspire, encourage and impel people to take required action).
- **ওইরিখ ও কুঞ্জ (H. Weihrich & H. Koontzt)** বলেছেন, "সব ধরনের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং সমরূপ শক্তিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত সাধারণ পদবাচ্যকে প্রেষণা বলে"। (Motivation is a general term applying to an entire class of drives, desires, needs, wishes and similar forces).

প্রেষণার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

(Importance of Motivation) :

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি তার মানব সম্পদ। শ্রমিক-কর্মীদের সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত সংগঠনের কার্যসমূহ সাফল্যজনকভাবে

সম্পাদিত হতে পারে না। এ কারণে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের প্রেষণাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রেষণা যে কোনো সংগঠনের জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বহন করে থাকে:

1. **উৎপাদন বৃদ্ধি (Increasing production):** উপযুক্ত প্রেষণাদানের ফলে শ্রমিককর্মীরা প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে তাদের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে। এতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই প্রেষণা ও উৎপাদনের সম্পর্ক নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়:

$P = f(a \times m)$

যেখানে—

P = *কর্ম-সম্পাদন (Performance)*
f = *অপেক্ষক (functions)*
a = *কার্যক্ষমতা (ability)*
m = *প্রেষণা (motivation)*

2. **মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার (Proper use of human resources):** প্রেষণা কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে কর্মী তার সকল প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠানের কাজে নিয়োজিত করে। এতে মানব শক্তির পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। পরিশেষে প্রতিষ্ঠানে উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটে।

3. **দক্ষতা বৃদ্ধি (Increasing efficiency):** কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের প্রেষণা দেওয়া হলে কর্মীরা তাদের উপর প্রদত্ত দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করতে সচেষ্ট হয়। এতে কাজের প্রতি তাদের মমত্ব বাড়ে। প্রতিষ্ঠানের কাজকে নিজের কাজ মনে করে কর্মীরা সকল কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে বিধায় তাদের সক্ষমতা ও কর্ম-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

4.অপচয় হ্রাস (Reduction Wastage): প্রেষণা কর্মীদেরকে দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনে প্রেষণা যোগায়। এতে কাজের ক্ষেত্রে সময় এবং সম্পদের অপচয় হ্রাস পায়।

5.কর্মীদের চাকুরি ত্যাগের হার হ্রাস (Reduction of labour turnover): প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আর্থিক ও অনার্থিক উপায়ে প্রেষিত করা হলে তারা সহজে উক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যেতে চায় না। এতে প্রতিষ্ঠানে কর্মী-ঘূর্ণায়মানতা (labour turnover) হ্রাস পায়।

6.শ্রমিক আন্দোলন হ্রাস (Reduction of labour movement): যে প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রেষণা কাম্য পর্যায়ে থাকে সে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। ফলে উৎপাদন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

7.নির্দেশনার সঠিক বাস্তবায়ন (Proper implementation of direction): প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রেষণা উঁচু মানের হলে ব্যবস্থাপকগণ সহজে তাদের দ্বারা নির্দেশ পালন করিয়ে নিতে পারেন। কারণ অনুপ্রেষিত কর্মীরা সহজে ব্যবস্থাপকের নির্দেশ পালন করে।

8.সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ (Proper maintenance of equipment): অনুপ্রেষিত কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সম্পদ, যথা— যন্ত্রপাতি, কাগজপত্র, কম্পিউটার, টাইপরাইটার ও অন্যান্য মালামাল সঠিকভাবে সংরক্ষণে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে।

9.প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি (Enhancement of organisation's goodwill): কর্মীদের মধ্যে প্রেষণা বিরাজ করলে তারা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়নে সদা তৎপর থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

10.ব্যবস্থাপনা-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন (Development of management-labour relation): কর্মীদের প্রেষণা উঁচু মানের হলে তারা ব্যবস্থাপকদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে এবং তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। এতে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

11.সৃজনশীলতার বিকাশ (Manifestation of creativity): কর্মীদের মধ্যে প্রেষণা বিরাজমান থাকলে তারা সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা বিকাশে উদ্যোগী হয়। তাদের নব নব ধারণা ও উন্নয়নমূলক চিন্তা প্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

নেতৃত্বের ধারণা

নেতৃত্ব কাকে বলে?

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের মানবীয় শ্রম ও যান্ত্রিক শক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে। নেতৃত্ব কর্মীদের মনোবলকে চাঙ্গা করে।

নেতা ও নেতৃত্ব।

একজন নেতার উদ্যোগ, তদারকি, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা জাগ্রত করে এবং কার্য সম্পাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ কারণে একটি সংগঠনে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে নেতৃত্ব বা লিডারশিপ কী বা নেতৃত্বের সংজ্ঞা, ধারণা ও নেতৃত্বের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

একজন আদর্শ নেতার গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যঃ

একজন নেতা তাঁর দল, সংগঠন, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অপরাপর সদস্যগণের পথপ্রদর্শকরূপে চিহ্নিত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নেতাকে প্রশাসক বলা যায়। প্রতিষ্ঠান একজন নেতা হলেন প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা, যিনি উদ্দেশ্যাবলি ও পরিকল্পনা প্রণয়নকারী। বহুমুখী দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন নেতাকে বিচিত্রগুণের অধিকারী হতে হয়। তবে নির্দিষ্ট করে এর একটি গুণের তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। কারণ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বা বিষয় বিশেষে নেতৃত্বের গুণাবলি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

এখানে একজন নেতার ৩০ টি সাধারণ (আবশ্যক) গুনাবলি উল্লেখ করা হলো-

সাহসীকতা: যিনি নেতা হবেন তাকে হতে হবে নির্ভীক। ভয়-ডরহীন ভাবে তিনি প্রত্যাশিত লক্ষ্যে যাবেন অধীনস্থদের নিয়ে।

মোহনীয় ব্যক্তিত্ব: একজন সফল নেতাকে হতে হবে মোহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি তার আচরনে সবাইকে মুগ্ধ করে প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবেন।

সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তি: একজন সফল নেতার সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তির অধিকারী হতে হবে। তাকে পরিকল্পনা প্রনয়নে ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্বাচনের জন্য কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিতে হবে। সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তি যার মধ্যে নেই সে নেতা হলেও উত্তম নেতা হতে পারে না।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা: লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনামাফিক একজন নেতা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবেন, যা স্বাভাবিক। আর তাই নেতাকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা থাকতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে বা যে-কোনো সঠিক ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা প্রদর্শন করে দল বা গোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে হয়।

সার্বিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণের মানসিকতা: একজন প্রসাসককে সকল অবস্থায় সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহনের মানসিকতা থাকতে হবে। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো যৌক্তিক ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতা একজন নেতার থাকা চাই।

শারীরিক সুস্থ্যতা: যিনি নেতা হবে তাকে শারীরিকভাবে সুস্থ্য থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে কখনো নেতার আসনে বসা যায় না। তবে বাস্তবক্ষেত্রে যদি এমন লক্ষ্য করা যায়, তা [illegible] নেতার উপযোগী।

পরিবেশ ও সংগঠন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা: নেতার অবশ্যই পরিবেশ ও সংগঠন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। নানা ধরনের উন্নয়নে তাকে পরিবেশ ও সংঠনের মধ্য দিয়েই কাজ করতে হয়।

মানবচরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা: একজন নেতা, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসক, যেহেতু মানুষ নিয়ে কাজ করবেন সেহেতু তাকে মানুষের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিগত জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাংগঠনিক জ্ঞান: একজন নেতার সাংগঠনিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক জ্ঞান তাকে নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কাজ করতে সাহায্য করবে।

যোগাযোগের দক্ষতা: সংগঠনের সকলের সাথে ও সংশ্লিষ্ট সমাজের সাথে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা একজন নেতাকে গড়ে তুলতে হয়। তিনি এমন যোগাযোগ কৌশল নির্ধারন করবেন যেন প্রতিষ্ঠানের সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমশীলতা: একজন নেতার অবশ্যই আত্মনিয়ন্ত্রণ দক্ষতা থাকতে হবে এবং সংযমী হতে হবে। আবেগ ও যথেচ্ছাচার সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস ডেকে আনে।

ন্যায়পরায়ণতা: নেতা হবেন ন্যায় পরায়ণ। তিনি অন্যায় ও অবিচারের প্রতি বশীভূত হবেন না।

সহযোগিতামূলক মননশীলতা: সকলের সাথে সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অধস্তন কর্মচারী ও সমাজ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা: প্রশাসক বা নেতাকে সব সময়ই বিচার বিবেচনা করে চলতে হয়। তার অজ্ঞতা ও অবিবেচনাপ্রসূত অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

বন্ধুপ্রতিমতা: নেতা হবেন সকলের প্রতি বন্ধু প্রতিম। তিনি সকলের বন্ধু ও দুর্দিনের সহায়ক হিসেবে থাকবেন।

বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা: নেতার অবশ্যই বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা থাকতে হবে কারণ তাকে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সাহস ও উদ্যম: সাহস ও উদ্যম নেতার যেকোন নেতার একটি মৌলিক গুণ হিসেবে স্বীকৃত। যে-কোনো বিপদে নেতা ভেঙ্গে না পড়ে সাহসের সাথে এগিয়ে যাবেন উদ্যমি মনোভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবেন।

সময় সচেতনতা: নেতাকে সময় সচেতন হতে হবে কারণ তিনি সময় সচেতন না হলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে ব্যঘাত ঘটবে, অধস্তন ব্যক্তিরা কাজে ফাঁকি দিতে চাইবে।

সংশ্লিষ্ট কার্যবিষয় জ্ঞান: নেতা যে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রধান সে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক, অন্যথায় দক্ষতার সাথে কার্য পরিচালনা সম্ভব না।

ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা: পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগঠন পরিচালনা না করে কর্মির ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। যদি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি ও মতভেদ থাকে তবে তাঁদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

নমনীয় মনোভাব: নেতার বা প্রশাসকের সব সময় নমনীয় মনোভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা উচিৎ। প্রয়োজনে নীতি, সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, আদেশ, নির্দেশ পরিবর্তন করে উপযোগী ধারা প্রবর্তন করা নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অনুসন্ধিৎসু: নেতাকে অনুসন্ধিৎসু হতে হয়। কোনো ঘটনা বা সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে উৎসাহী হলে তা সমাধান করাও সহজ হবে।

সৃজনী প্রতিভা: প্রশাসক বা নেতাকে সৃজনী প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। এর বিকাশ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনা সম্ভব।

আন্তরিকতা: প্রশাসক হবেন প্রতিষ্ঠান ও কথা কর্মিদের প্রতি আন্তরিক।

পরমতের ওপর শ্রদ্ধাশীলতা: পরমতের প্রতি স্রদ্ধাশীলতা যে-কোনো মানুষের অন্যতম একটি সুন্দর গুণ যা একজন প্রশাসক বা নেতার মধ্যে অবশ্যই থাকতে হয় যার দ্বারা তিনি সবার মতামতই সমান গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন এবং উপযুক্ত হলে কাজে লাগাবেন।

সাধারণ জ্ঞান: নেতা হবেন ব্যাপক সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। অজ্ঞ লোক কখনো নেতৃত্ব কিংবা সংগঠন চালাতে পারে না।

অধ্যবসায়: নেতাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। দৈনন্দিন খবর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি হবেন অধ্যবাসায়ী।

আত্মসমালোচনা: এক জন নেতার জন্য আত্মসমালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভুল তিনি খুঁজে পেলে ভবিষ্যতে ভুল কম হবে।

সার্বিক ধারণা: নেতাকে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সাথে জড়িত কর্মি, কাজ, সমাজ, বাজার, চাহিদা, মানুষের আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সার্বিক ধারণা থাকতে হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৌলিক ধারণা ও কৌশলসমূহ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি বা কি বুঝ?

সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানব জীবনের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি। একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে এই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরই। একমাত্র সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই বদলে দিতে পারে একজনের জীবন। তাই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে কি বুঝায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর আজকের আর্টিকেলটি সাজিয়েছি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাঃ

- ১. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার
- ২. উদ্দেশ্য অর্জন
- ৩. দক্ষতা বৃদ্ধি
- ৪. সম্পর্কোন্নয়ন
- ৫. সমস্যার সমাধান
- ৬. সঠিক কার্যধারা অনুসরণ
- ৭. ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ
- ৮. গতিশীলতা সৃষ্টি
- ৯. নিয়মিত প্রশিক্ষণ
- ১০. উপাদান চিহ্নিতকরণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে কি বুঝায়-

একজন ব্যবস্থাপককে যা কিছুই করতে হয় তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে করতে হয়। তাই অনেকেই ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া মনে করেন। সাধারণ ভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ হতে উত্তম পন্থা গ্রহণ করাকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি সে সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১. **P. F. Drucker**-এর মতে, "একজন ম্যানেজার যা কিছু করেন তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই করেন।"

২. **অহিরচ ও কুঞ্জ**-এর মতে, "বিকল্পগুলো হতে একটি কার্যধারা নির্বাচন করাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে।"

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ সমূহঃ

ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এ জটিল প্রক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে কতিপয় ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপসমূহকে অনুসরণ করতে হয়। নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হল।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ (Various steps of decision making)

- ১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসকরণ
- ২. সমস্যা বিশ্লেষণ
- ৩. অগ্রাধিকার নির্ধারণ
- ৪. তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ
- ৫. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান সনাক্তকরণ
- ৬. বিকল্প উদ্ভাবন
- ৭. বিকল্প মূল্যায়ন
- ৮. কাঙ্ক্ষিত বিকল্প নির্বাচন
- ৯. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
- ১০. ফলাবর্তনের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ

১. সমস্যার চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসকরণ
(Identifying and classifying the problem)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই হল প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সমাধান। তাই **প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।** এ সমস্যা চিহ্নিত করতে ভুল হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করার লক্ষ্যে কি কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন তা প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে এবং এর প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলোকে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে।

২. ***সমস্যা বিশ্লেষণ (Analyzing the problem):*** সমস্যা চিহ্নিত করা এবং শ্রেণীবিন্যাসের পর এর প্রকৃতি, কারণ ও ফলাফল সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে যে সমস্যাটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হয়।

৩. *অগ্রাধিকার নির্ধারণ (Determining priority)*

প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় একাধিক সমস্যা একসাথে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি সিদ্ধান্ত একসাথে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সবগুলো সমস্যা একই জাতীয় গুরুত্ব বহন করে না। এমতাবস্থায় ব্যবস্থাপনাকে অপেক্ষাকৃত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

৪. *তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ (Collecting data and information)*

প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ উপাত্ত সংগ্রহের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থকতা নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ করে কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটলে এসব তথ্যসমূহ সিদ্ধান্তে ইতিবাচক ফল আনয়ন করে। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্তকারীকে তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক।

৫. *প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান সনাক্তকরণ (Identifying inhibiting factors):*

সিদ্ধান্তকে সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ সনাক্তকরণ। এ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহের সনাক্ত করা প্রয়োজন।

৬. *বিকল্প উদ্ভাবন (Generation of development)*

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনেই বিভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব সমস্যাসমূহ যথাযথ সমাধানের জন্য একাধিক বিকল্প উদ্ভাবন করতে হয়, কারণ শুধুমাত্র একটি উপায় থেকে কোন মুখ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

৭. *বিকল্প মূল্যায়ন (Evaluation of alternatives)*

প্রতিষ্ঠানের একাধিক বিকল্প থেকে যে কোন বিকল্প ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হলে গৃহীত সিদ্ধান্তটি সফল ও কার্যকর হতে পারে না। তাই প্রতিষ্ঠানে কোন বিষয়ে নিরপেক্ষ ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এর নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

৮. *কাঙ্ক্ষিত বিকল্প নির্বাচন (Selection of the desired alternative)*

মূল্যায়নকৃত বিকল্পসমূহ হতে সবচেয়ে উত্তম বিকল্পটি নির্বাচন করা সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক কাজ। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বিকল্পসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বিকল্পটি রেখে বাকীসমূহ পরিত্যাগ করে থাকেন।

৯. *সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (Implementation of decision)*

শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই এর মূল লক্ষ্য নয়, এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সফলতার সাথে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। কেননা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকারিতা সাধারণত গৃহীত সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। তাই গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যাসমূহ বাধা সৃষ্টি করে সেসব সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে হয় এবং তার প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

১০. *ফলাবর্তনের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ (Monitoring the decision to get feed back)*

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ বা প্রক্রিয়া হচ্ছে যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা এবং কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ সম্পর্কে স্বনামধন্য ব্যবস্থাপনা বিশারদ Peter F. Draker বলেছেন, “Best monitoring system is one in which the manager actually goes and looks." এক্ষেত্রে সরাসরি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট ফলাবর্তন প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তোমাদের সকল প্রশ্ন ই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ন
কার কি প্রশ্ন আছে বল .....

সবাই ভাল থাকবে ....

ধন্যবাদ